দশঘরা : বিশ্বাস ও রায় পরিবার নিয়ে কিছু কথা

অরিন্দম গায়েন [1*]

[1*] সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, নেতাজি সুভাষ আশ্রম মহাবিদ্যালয়,

বিমূর্ত

তারকেশ্বর থেকে ১৩ কিমি দূরে উত্তরে অবস্থিত একটি ছোট গ্রাম দশঘরা। এটিকে মন্দিরের ছোট শহর বলা হয়। টেরাকোটা মানেই শুধু বিষ্ণুপুর নয়, বাংলার এই গ্রামে এক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ। মন্দিরের কারুকার্য সদৃশ। টেরাকোটার এত সূক্ষ কাজ সত্যি দুষ্প্রাপ্য। প্রতিটি মন্দিরের টেরাকোটার প্যানেলগুলি এখনো ভালো অবস্থায় আছে। দশঘরার বেশিরভাগ স্থানই ঐতিহাসিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ ঘেরাও করে, তবুও স্থানটির আকর্ষণ কমায় না। দশঘরার পরিদর্শনকারী পর্যটকদের কেন্দ্রীয় আকর্ষণ মুঘল আমলে নির্মিত একটি মন্দির, সজ্জিত টেরাকোটার কাজের সাথে প্রশংসিত। গ্রামটি একটি সুন্দর ঔপনিবেশিক বাগান দ্বারা সাজানো হয়েছে, যার শোভা সাইট মার্জিত মার্বেল মূর্তি দ্বারা উন্নত করা হয়। শ্রীরামপুর মাহেশের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম রথ এই গ্রামে চিহ্নিত করা হয়।

শব্দসূচী : কাছারি বাড়ি, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ, নহবতখানা, গোপীনাথ মন্দির, গোপীসাগর, বিশালাক্ষি জোড়বাংলা মন্দির, আটচালা শিব মন্দির, ভিক্টোরিয়ান তোরণ, ঘড়ির টাওয়ার, রায় বাড়ির মন্দির, ছোট সিংহ দরজা, নাচ ঘর, দাতব্য চিকিৎসালয়, ব্রাডলি বার্ট বাংলো।

হুগলী জেলার ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত গ্রাম "দশঘরা"। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে ধনিয়াখালী বা গুড়াপ রেলস্টেশন অথবা হাওড়া-গোঘাট মেইন লাইনে তারকেশ্বর রেলস্টেশন থেকে বাস বা ট্রেকারে দশঘরায় যাওয়া যায়। তারকেশ্বর শৈবতীর্থ থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৩ কিমি। ধনিয়াখালী থেকে হলে ৭ কিমি। কলকাতা থেকে এর অবস্থান ৬৬ কিমি। কথিত আছে, এই গ্রামটি বারদুয়োরি রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই বারদুয়োরি রাজবংশের রাজারা এখন আর এই গ্রামে দেখতে পাওয়া যায় না। বহুকাল আগে এরা এইখানে ছিল, তখন সমগ্র গ্রামটিতে বন-জঙ্গলে ভরা ছিল। সুধীরকুমার মিত্র তাঁর "হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" গ্রন্থে দ্বিতীয় খন্ডে লিখেছেন – 'পাল বংশীয় এক কায়স্থ নরপতি দশঘরার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন বলে রজনীকান্ত রায় লিখেছেন। কিন্তু এই রাজবংশের কথা কোনো ইতিহাসে নেই। মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দা রাজবংশের পূর্বপুরুষ নারায়ানচন্দ্র পালচৌধুরী মুসলমানদের অত্যাচারে দশঘরা ত্যাগ করে মেদিনীপুরে জমিদারি সনন্দ গ্রহণ করেন। দশটি ছোট ছোট গ্রাম নিয়ে গঠিত হয়েছিল বলে এর

নাম হয় দশঘরা। এই দশটি গ্রামএখন বর্তমান। গ্রাম গুলো হলো শ্রীকৃষ্ণপুর, জাড়গ্রাম, দিঘরা, আগলাপুর, শ্রীরামপুর, ইছাপুর, গোপীনগর, গঙ্গেশনগর, পারাম্বো ও নলথোবা। দশঘরা বলে একটি পৃথক মৌজা থাকলেও সরকারি গ্রন্থে উল্লেখিত একটি গ্রামকেই দশঘরা বলা হয়'[1]। হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটারে বলা হয়েছে, - "Although there is a separate mousa called Dasghara, the name loosely applies to a number of neighbouring villages. Srikrishnapur, Rajendrabati, Ghanashyampore, not Hamid, Haidargunj, Dasghara a Dhighir"[2].

মুঘল আক্রমনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাজারা মহামূল্যবান মোহর রত্ন সামগ্রী গুলো দিঘির জলের নীচে লুকিয়ে রাখতো বলে এর নাম হয়েছে দশঘরা। মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহ তাঁর সৈন্য বাহিনী নিয়ে দশঘরা থেকে কিছু দূরে চকদিঘি গ্রামে অবস্থান করেছিলেন বলে জানা যায়

অতি সুন্দর পরিবেশ এই গ্রাম। এই গ্রামে প্রাকৃতিক শোভা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। এই গ্রামের পাশ দিয়ে কানা নদী প্রবাহিত হয়েছে। এই কানা নদীটি হল গোদাবরী নদীর একটি শাখা বা মরা নদী। এই নদীর পাশেই বিশ্বাস ও রায় পাড়ায় রাজাদের বাসস্থান। প্রাচীনকালে বিদেশি বণিকরা এই নদী পথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। বর্তমানে এই নদীর জল প্রায় সময়েই শুকিয়ে যায়, কোনো সময় জল থাকে আবার কোনো সময় থাকে না। দশঘরা গ্রাম হয়ে ধনিয়াখালীর দিকে যেতে একটা গ্রাম পড়বে, এই গ্রামটা হলো 'কানা নদী গ্রাম'। এই গ্রামের পাশ দিয়ে কানা খাল বয়ে গেছে। এই গ্রামের কিছু রহস্য আছে, যা এখনো ভালো কিছু জানা যায় নি। এই গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আদিবাসীদের বাসস্থান ছিল। " আদিবাসীদের নাচ-গান ও তীর ধনুক প্রতিযোগীতায় বিজয়ীগণকে রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হত। এই আদিবাসীদের বিখ্যাত উৎসব ছিল 'টুসু'। সন্ধ্যায় টুসু ঠাকুরকে কানা নদীর জলে বিসর্জন দেওয়া হয়"3। এই টুসু কথার অর্থ হলো 'ফসলের উৎসব'। গ্রামের বাইরে থেকে পুরুষ, নর-নারীরা এই উৎসবে আনন্দ করে মেতে থাকতো।

ঐতিহ্যময় মন্দিরের শহর হল দশঘরা। দশঘরা কে 'বাংলার বিষ্ণুপুর' বলা হয়। 'টেরাকোটার শিল্প' এই গ্রামকে বলা হয়। এই গ্রামে পুরাকীর্তির নির্দশন সর্ষে দানার মতন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই গ্রামের বাইরে পাশাপাশি বেশ কিছু জায়গায় পুরাকীর্তির চিত্র দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলো হল – আঁটপুর, দ্বারহাট্টা, রাজবলহাট, গুড়াপ, ভাঙামোড়া, ভান্ডারহাটি, বৈকুণ্ঠপুর, সোয়ালুক ও দেউলপাড়া। এই গ্রামে সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায় বিশ্বাস পাড়ায় গোপীনাথ মন্দির, রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, চন্ডীমণ্ডপ, শিবমন্দির, নহবতখানা, গোপীসাগর, কাছারি বাড়ি, বিশালাক্ষী জোড়বাংলা মন্দির এবং রায় পাড়ায় শিবমন্দির, ঘড়ির টাওয়ার, বড় খিলান গেট, রায় বাড়ির নাচঘর, সিংহ দুয়ার, ব্রাডলি বার্ট বাংলো, বিপিনকৃষ্ণ রায়ের ম্যানশন বাগান ও চ্যারিটেবল ডিসপেনশনারী ইত্যাদি। এইখানে বেশ কিছু কিছু মন্দির দেখা যায় না, সেগুলো এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এগুলো ছাড়া হুগলির দ্বিতীয় বৃহত্তম রথ এই গ্রামে দেখতে পাওয়া যায়। এটি বিশ্বাসদের দ্বারা পরিচালিত রথ।

চিত্র-১ : কাছারি বাড়ি, বিশ্বাস পাড়া, দশঘরা, হুগলী

বন্ধুকে নিয়ে দশঘরা গ্রামের দিকে যাত্রা করলাম। পৌছালাম বিশ্বাস ও রায় পাড়ায় জমিদার বাড়িতে। ব্রিটিশদের তৈরি মার্বেল প্যালেস এর স্টাইলের আদলে বিশ্বাসদের কাছারি বাড়িটি গড়ে তোলা হয়েছে। বাড়িটি অপূর্ব। বাড়িটি সাদা রঙে আছন্ন। বাড়িটি ৬ টি স্তম্ভের উপরে আছে ত্রিভুজের মতন আকৃতি, এতে তিনটি ঘোড়া ও চাঁদের ছবি দেখা যাচ্ছে। এই গ্রামের বিশ্বাস পাড়ায় বিখ্যাত জমিদার ছিলেন জগমোহন বিশ্বাস। তিনি জাতিতে উড়িষ্যার মানুষ ছিলেন। তিনি বারদুয়োরি রাজা রামনারায়ন পালচৌধুরীর কাছ থেকে রাজস্ব চুক্তি বা লিজ নিয়ে এই গ্রামে বসতি স্থাপন করেন এবং দশঘরা গ্রামকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা সদানন্দ বিশ্বাস বিখ্যাত গোপীনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এটিকে জিউ মাতার মন্দির বলা হয়। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠানকাল ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দ। হুগলী জেলা গেজেটিয়ারে লেখা আছে : " The Pancharatna temple of Gopinath built by Sadanada Biswas in AD 1729 and standing within the predicts of the residence of the Biswas family is remarkable for the excellent terracetta embelishments decorating it's fcades"[4]. তখন ভারতবর্ষের মুঘল সম্রাট ছিলেন মহম্মদ শাহ। এটি একটি পঞ্চরত্ন মন্দির। এই পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এসেছে রত্ন মন্দির থেকে। রত্ন মন্দির বলতে সাধারনতঃ চূড়া বা শিখরকে বোঝানো হয়। চালা মন্দিরের উপর চূড়া বসানো থাকলে তখন তাকে রত্ন মন্দির বলা হয়। এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হল চারদিকে বাঁকানো কার্নিস। রত্ন মন্দিরকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল পঞ্চরত্ন। চারচালার মাঝখানের ছাদে একটি রত্ন থাকলে তাকে একরত্ন বলে। এই একরত্ন ছাদের চার কোনায় চারটি ছোট ছোট রত্ন বসানো থাকলে তাকে পঞ্চরত্ন বলা হয়। বাংলার অনেক স্থানে এই পঞ্চরত্ন মন্দির দেখতে পাওয়া যায়।

গোপীনাথ মন্দিরটি ২৫০-৩০০ বছর আগের পুরানো। এই মন্দিরটি টেরাকোটা কাজে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেছে। এই টেরাকোটার কথার অর্থ হল " পোড়ামাটি "। 'মাটির সাথে খড়কুটো মিশিয়ে কাদামাটি প্রস্তুত করা হত। এই কাদামাটি থেকে মূর্তি তৈরি করে রোদে শুকানো হয়। পরে আগুনে পুড়িয়ে টেরাকোটা ভাস্কর্য তৈরি করা হয়'[5]। বিশ্বাসদের কাছারি বাড়িটির পাশেই এই মন্দিরটি অবস্থিত। বিশ্বাস বাড়ির দুর্গা দালান থেকে এই মন্দিরটি দেখা যায়।

মন্দিরটি ইট দিয়ে তৈরি। এই মন্দিরের উচ্চতা ৪০-৫০ ফুট বলে ধরা হয়। মন্দিরটি দেখতে রথের মতন এবং ত্রিখিলানবিশিষ্ট। মন্দিরের বাইরের তিন দিকের দেওয়ালে হরেকরকম টেরাকোটা চিত্র বা দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। মন্দিরের ফলক গুলির মধ্যে আছে রামায়ণ-মহাভারতের ছবি, গাছপালা, পশু-পাখি, লঙ্কাকাণ্ডের যুদ্ধ, কৃষ্ণলীলা, নর-নারীর নাচ প্রভৃতি দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। আজ থেকে ৪০-৫০ বছর আগে বহু টেরাকোটা মূর্তি-ফলক গুলি নষ্ট হয়ে গেছিল। সেগুলি আবার নুতন করে কলকাতার কুমোরটুলি শিল্পী তারাপদ পালকে দিয়ে তৈরি করানো হয়। আগের মূর্তি ও ফলকগুলি যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবে তৈরি করানো হয়। নুতন ফলকগুলির মধ্যে আছে শ্রীচৈতন্যের সপারিষদ ভক্তবৃন্দ সংকীর্তন, মহিষাসুরমর্দিনী, দেবী মা দুর্গা, লক্ষী, বীণাবাদনরত সরস্বতী ইত্যাদি। মন্দিরের উপরের চারদিকে চারটি বাঁকানো কার্নিশের গায়ে 'বাস-রিলিফের' অনেক টেরাকোটা মূর্তি বর্তমান। কার্নিসের নিচের চারটি কোণে অসাধারণ 'মৃত্যুলতা' বা 'কল্পলতা' প্যানেল দেখতে পাওয়া যায়। শম্ভু ভট্টাচার্য তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের মন্দির' গ্রন্থে বলেছেন - " 'কল্পলতা' হল উপর থেকে নীচে লতার মত কোণাচ। হাতি, সিংহ, লতা-পাতা অরণ্যের প্রতীক। এইভাবে মন্দির হয় অভীষ্ট ফলপ্রদ 'কল্পতরু'। আবার সমস্ত মায়ার মৃত্যু ঘটায় বলে একে 'মৃত্যুলতা'-ও বলা হয়"[6]। এগুলো ছাড়া আরো সামাজিক জীবনের বেশ কিছু ফলক চিত্রিত হয়েছে, যেমন- স্ত্রীলোকের চরকাকাটা, সাধু ব্যক্তি, বন্দুক হাতে নিয়ে সৈনিক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের ভিতরে আছে রাধা-গোপীনাথের মূর্তি। মন্দিরের সামনে প্রার্থনা ও বসার জায়গা আছে।

গোপীনাথ মন্দিরের পাশে একটি নাটমন্দির আছে। এটি ১৮৩৬ সালে তৈরি হয়। কাছারি বাড়ির ভিতরে ঠাকুরদালানে প্রতি বছর দুর্গা পূজা হয়ে আসছে। বিশ্বাস বাড়ির দুর্গা পূজা প্রাচীনতম প্রচলিত রীতি। বিশ্বাসদের জমিদার বাড়ি ঢোকার আগে একটা সাদা তোরণ চোখে পড়ে। তোরণটি অসাধারণ। তোরণটি ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। এই কাছারি বাড়িটির পাশেই একটা দিঘী বা পুকুর আছে, তার নাম 'গোপীসাগর'। গোপীনাথের নাম থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে। বাড়িটির ডান দিকে আছে ঘন গাঢ় লাল রঙের একচূড়া দোলমঞ্চ, সাতটি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়। পুকুর পাড়ে ঘেঁষেই এটি অবস্থিত। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এটি তৈরি হয়েছিল। দোলমঞ্চের পাশেই আছে আটটি খিলান ভাবে যুক্ত সাদা রঙের 'রাসমঞ্চ'। বাঁদিকে আছে বিশ্বাসদের বৈঠকখানা ও ৬ টি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে 'নহবতখানা'।

বিশ্বাসদের দুটি আটচালা শিব মন্দির আছে। একটি বিশ্বাস পাড়ায় এবং অপরটি বামুনপাড়ায় বিশালাক্ষি তলায়। বামুনপাড়ায় মন্দিরটি খুবই প্রাচীন। মন্দিরটি ইট দিয়ে তৈরি এবং পশ্চিমমুখী। সামনের দিকে তিনটি খিলান ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, এটি মন্দিরের প্রবেশপথ। মন্দিরটি ভঙ্গুর, জরা-জীর্ণ এবং গাছের

ডাল পাতা দিয়ে আবরণে ঢাকা। কিছু অক্ষত অবস্থায় আছে। গোপীনাথ মন্দিরের পর এই মন্দিরের অবস্থান, এটি ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। গোপীনাথ মন্দিরের বাইরের দেওয়ালের নকশা থেকে এই মন্দিরের কিছু আভাস মেলে। মন্দিরের কোনো মূর্তি ফলক নেই। তবে কিছু ফুলের বড় বড় নকশা এবং দু-একটা খোদাই করা আছে।

এই আটচালা মন্দিরের পাশেই আছে বিশালাক্ষী জোড়বাংলা মাতার মন্দির। এই মন্দিরটি বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরের ধাঁচের মতন দেখতে। এই মন্দিরটি পরস্পর সংযুক্ত দুটি দো-চালা কুটিরের সমন্বয়ে গঠিত। এই মন্দিরের দেওয়ালে টেরাকোটার কোনো কাজ নেই। 'মন্দিরের ভিতরে আছে শাড়ি পরিহিতা মা বিশালাক্ষী দেবীর মূর্তি দন্ডায়মান। গলায় নরমুণ্ডমালা। দেবীর মুখের দন্তপংক্তি বিকশিত, স্মিতহাস্যযুক্ত'[7]।

সদানন্দ বিশ্বাসের পরবর্তী বংশধরগণ বিশ্বাস পরিবারের জমিদার ছিলেন। এই প্রসঙ্গে মানগোবিন্দ বিশ্বাসের নাম উল্লেখ্য। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর তিনি দশঘরাতে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানকাল ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ। বিদ্যালয়টি দশঘরাতে হাশোলি গ্রামে অবস্থিত। ১০০ বছর পর ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে এই বিদ্যালয় পূর্ণ হলো। বাংলার প্রাচীনতম স্কুলগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। নরেন্দ্রকৃষ্ণ বিশ্বাস, নিমাইচন্দ্র বিশ্বাস, নির্মলচন্দ্র বিশ্বাস, রজনীকান্ত বিশ্বাস, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বিশ্বাস, পীতপাবন বিশ্বাস, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বিশ্বাস, বীরশ্রেষ্ঠ বিশ্বাস, পৃথ্বীশচন্দ্র বিশ্বাস এবং অন্য কিছু মহান আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ১৯৫৯ সাল থেকে এই বিদ্যালয়ের উচ্চমাধ্যমিক কোর্স চালু হয়। বিশ শতকের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন বোস কর্তৃক 'সাতবদা স্মরণিকা' প্রতিষ্টিত হয়েছে। ১৯৭৬ সাল থেকে এই বিদ্যালয়ের গবেষণার মান শুরু হয়েছে। বিদ্যালয়ের একখানি সাদা পাথরের ফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখা আছে : 'The building has been constructed and donated in memory of Late Revered Nimai Chandra Biswas by his sons & grandsons Late K C Biswas. Sri J. C. Biswas, Sri P. C. Biswas & Sri R. K. Biswas. Tablet affixed by the Managing Committee of the School, October 1955'।

বিশ্বাস বাড়ির পর এবার রায় বাড়ি দর্শন করলাম। এখানে বেশ কিছু পুরাকীর্তি দেখতে পাওয়া যায়। এই রায় বাড়ির বিখ্যাত জমিদার ছিলেন বিপিনকৃষ্ণ রায়। তিনি এই বংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি কলকাতা বন্দরের স্টিভেডর অধীনে কাজ করতেন। তিনি প্রচুর টাকা উপার্জন করে দশঘরা গ্রামে চলে আসেন এবং ধন সম্পত্তির মালিক হন। তিনি এখানে বিশাল বড় বাড়ি বানান , প্রচুর জমি জমা কেনেন এবং জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। রায়দের রাজবাড়ি ঢুকতে গেলে একটা বিশাল গেট বা তোরণ পেরোতে হয়। এই তোরণটি হল সিংহের দরজা অর্থাৎ তোরণের উপরে দুই দিকে সিংহ দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে আছে রাণী ভিক্টোরিয়া, তার দুপাশে আছে দুই নারী মূর্তি। রায় বাড়ির তোরণটি গভর্নর হাউস অফ ক্যালকাটার (রাজভবন) আদলে তৈরি। এই তোরণটির পাশেই আছে দুটি ভাঙা সিংহের ছোট গেট। গেট গুলোর অবস্থা খুবই সঙ্গীন। এই গেটের ভিতরেই ছিল বিপিনকৃষ্ণ রায়ের ম্যানশন বাগান। এটি এখন গাছ গাছালিতে জঙ্গলে ভরা।

রায় বাড়ির প্রধান গেটের পাশেই উপরে আছে এক প্রাচীন ঘড়ি স্তম্ভ বা ক্লক টাওয়ার। তোরণ আর ঘড়ি পাশাপাশি গা ঘেঁষেই অবস্থিত। ঘড়িটি দেখতে অষ্টভূজাকৃতি, চারদিকে চারটি জানালা। জানালার কাঁচগুলো এখন ভঙ্গুর অবস্থায়। ঘড়িগুলি এখন আর চলে না কিন্তু কাঁটাগুলো স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ঘড়িতে এক প্রস্তুতকারক সংস্থার নাম লেখা আছে – J M DASS & BROTHERS, CALCUTTA। ঘড়িটির একদম মাথার উপরে দাঁড়িয়ে আছে এক নারী মূর্তি। এর ঠিক পেছনেই নাচ ঘর। নাচঘর এর সামনের উঠোনে বেশকিছু মূর্তি রাখা আছে যেগুলো দেখলে বোঝা যায় জমিদার মশাই বেশ সৌখিন ছিলেন। নাচঘরটি এখন কোনো অনুষ্ঠান হলে খুলে দেওয়া হয়। এছাড়া সবসময় বন্ধ করা থাকে। এর ভিতরটা বেশ ভালো আর ঠান্ডা। তোরণটির বাঁদিকে আছে এক বিশাল বড় শিব মন্দির। মন্দিরটি দেখতে উঁচু গম্বুজ আকৃতির এবং দেউল রীতিতে তৈরি। সামনে চালা সদৃশ ত্রিখিলান বিশিষ্ট। মন্দিরের টেরাকোটার কোনো কাজ নেই। সামনের দিকে উপরে দেখা যাচ্ছে ত্রিশূল, ডমরু আর সাপের আঁকা চিহ্ন। হুগলী জেলার পুরাকীর্তি গ্রন্থে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন – 'দশঘরায় অনান্য মন্দিরগুলির মধ্যে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে রামজয় মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দের মন্দিরটি সমতল ছাদ, উদগত কার্নিস এবং তদুপরি নাতিউচ্চ পরোট বিশিষ্ট। বন্দোপাধ্যায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত একটি প্রথাগত আটচালা শিবমন্দির ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ। তার নিচে বক্রবেষ্টনী। সুন্দর টেরাকোটার কাজ। ওই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত বাসুলি মন্দিরের নির্মাণকাল মধ্য-অষ্টাদশ শতক। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী, জোড়বাংলা ধরনের'[৮]।

প্রধান তোরণটির ঢোকার পর বাঁদিকে চোখে পড়বে ভারতীয় ডাকঘর। তার উল্টোদিকে আছে বিপিনকৃষ্ণ রায়ের প্রতিষ্ঠিত 'দাতব্য চিকিৎসালয়' বা 'Charitable Dispensary', সংক্ষেপে বলা হয় 'CD'। এই চিকিৎসালয়টি ১৯১৫ সালের পর থেকে শুরু হয়েছিল। এটি উদ্বোধন করেছিলেন জেনারেল হ্যারিস সাহেব। তিনি তৎকালীন সার্জেন ছিলেন। সুধীরকুমার মিত্রের মতে বলা যায়, "এই দাতব্য চিকিৎসালয় স্থানীয় চারপাশে দরিদ্র ও দুঃস্থ অধিবাসীদের রোগ নিরাময়ে সহায়তা করে। কঠিন অসুখ হলে জেলা পর্ষদের দেওয়া ওষুধ ছাড়াও তিনি বহু দামী ওষুধ নিরাময়ের জন্য সরবরাহ করতেন। এই চিকিৎসালয়ে নিম্নলিখিত উৎকীর্ণ আছে :

This building which was erected by the generosity Babu Bepin Kristo Roy was opened on the 30th January 1915 by surgeon general G.F.A Harris C.S.I, I.M.S. and handed over to the district Board of Hooghly for use as as Charitable Dispensary"[9]।

চিকিৎসালয় থেকে সোজাসুজি দেখতে পাওয়া যায় চকচকে দ্বিতল বাড়ি ভবন। বাড়িটির নাম 'ব্রাডলি বার্ট বাংলো'। এফ বি ব্রাডলি বার্টের নাম থেকেই এই বাড়িটির নামকরণ করা হয়। এটিই হুগলী জেলার প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট বাংলো। ১৯১৫ সালে তিনি এই বাড়িতে প্রথম আসেন এবং থাকতেন। এখন এই বাড়িতে ভাড়াটিয়া থাকেন। এই বাড়িটির সামনের দিকে আছে ঝিল বা পুকুর। এটি 'কৃষ্ণ রায় ঝিল'

নামে পরিচিত। 'ব্রাডলি বার্ট বাংলো' ও 'কৃষ্ণ রায় ঝিল' – এই দুইটি প্রতিষ্টা করেন বিপিনকৃষ্ণ রায়, বাংলা ২৯ শে বৈশাখ ১৩২০ সনে। এই বাংলোর সামনের দিকে লেখা আছে যে :

BRADLEY-BIRT-BUNGALOW : This Bungalow was first occupied by Mr. F. B. Bradley Birt I.C.S Magistrate Collector Hooghly on 25th August 1915.

বাংলো ভবনটির পাশেই আছে রাসমঞ্চ। তবে বাইরের গেটে তালা লাগানো থাকায় ভিতরে দেখা হলো না। দূর থেকে লক্ষ্য করলাম যে, রাসমঞ্চটি সাদার উপরে চকচকে রঙ করা গাছের ডাল পাতা আর নানা ধরণের মূর্তি। রাসমঞ্চের উল্টোদিকে আছে রায়দের প্রধান বাড়ি ও বাড়ির ভিতরে আছে বড় দুর্গা দালান। এখানে দুর্গাপুজো হয়। বাড়িটি দোতলা, উপরে বিশাল লম্বা বারান্দা, পাশেই পুকুর পাড় আর পুকুর পাড়ের ঘেঁষেই বড় বসার জায়গা। বাড়ির মূল দরজা আর পুকুর পাড়ের মাঝেই মাটির রাস্তা, এই রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল করে। বিশ্বাসদের মত রায় পরিবারের দুর্গাপুজো প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

তথ্যসূত্র :-

1) সুধীরকুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় খন্ড, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ২৭৯.
2) এ. কে. ব্যানার্জী, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটার : হুগলী, কলকাতা, ১৯৭২.
3) সুধীরকুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ২৮৬.
4) এ. কে. ব্যানার্জী, হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটার, কলকাতা ১৯৭২
5) প্রণব রায়, বাংলার মন্দিরচর্চা, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ৪৩-৪৪
6) শম্ভু ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির.
7) শ্যামল কুমার ঘোষ, বাংলার মন্দিরের খোঁজে, দশঘরা : গোপীনাথ ও বিশালাক্ষি মন্দির, ২৫/০১/২০১৭, ওয়েবসাইট
8) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হুগলী জেলার পুরাকীর্তি, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আগস্ট, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা - ৮১
9) সুধীরকুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৮১
10) তারাপদ সাঁতরা, পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্যে মন্দির ও মসজিদ , পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, কলকাতা.
11) কমল চৌধুরী, হুগলী জেলার সেকাল-একাল, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা.
12) সুধীরকুমার মিত্র, হুগলী জেলার দেব-দেউল, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার, কলকাতা, প্রথম অপর্ণা সং, ১৯৯১
13) নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা.
14) তিলক পুরকায়স্থ, টেরাকোটার গ্রাম দশঘরা, ২৬/০৩/২০১৮, ওয়েবসাইট.